দৈনিক খবর
তারিখ 0 8 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

29

নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা

● কে এম সোবহান ●

দীর্ঘকাল পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটখাট এক ধরনের কনভোকেশন হয়ে গেল ১লা অক্টোবর। এই দিনের নাম দেয়া হয়েছিল পদক প্রদান '৯২। ৬৬ জন কৃতী ছাত্র ও শিক্ষককে পদকগুলো দেয়া হয়েছে ১৫৮টি বিভিন্ন ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনের মধ্যে ১৬টি থেকে। এগুলো ১৯৮৬ সাল থেকে দেয়া হয়নি। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ববিদ্যালয় যাবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ দিন ভোররাতে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তারপর আর কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রঙ্গণে উপস্থিত হতে পারেননি। জেঃ জিয়া একবার গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে সেখান থেকে লাঞ্ছিত হয়ে চলে আসতে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। যেহেতু সামরিক শাসকদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রবেশ নিষেধ' ছিল সেই কারণে জেঃ জিয়া তাঁর রাজাকার প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেন। কিন্তু এখানে রাজাকারের প্রবেশের কোন প্রশ্নই উঠেনি। কাজেই রাজাকার আচার্য ছিলেন অনাকাঙ্খিত অতিথি। জেঃ এরশাদ অনেক পাঁয়তারা করেছিলেন। অনেক ঘুষ দিয়েছিলেন ও লোভ দেখিয়েছিলেন যথাযথ কর্তৃপক্ষকে। নিজ পছন্দমত উপাচার্যও মনোনয়ন করেছিলেন কিন্তু সকলই গরল ভেল। তিনি পায়ের চিহ্ন রাখতে পারেননি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেই ৪৭ সাল থেকে গণতন্ত্রকে উর্ধ্বে ধরে রেখেছে। তারা জাতীয়তাবাদী উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন করেছে, সংগ্রাম করে সফল হয়েছে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই ঐতিহ্য থেকেই তারা গণতন্ত্র বিরোধী। জাতীয়তাবিরোধী কোন রাষ্ট্র নায়ককেই ঢুকতে দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সেই দিক থেকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আচার্য হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁর আগমনের বিরোধিতা করেনি তবে দাবী তুলেছিল তাদের বিভিন্ন দাবী মেটাবার জন্য। তাদের দাবীগুলো অযৌক্তিক ছিল না বরং এগুলোর মধ্যে সবগুলো না হলেও কয়েকটি দাবী পূরণ করলেও নির্বাচিত সরকার প্রধানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলহতো।

যা নির্বাচিত সরকার প্রধানের জন্য, যিনি আচার্যের পদ গ্রহণ করেছেন হতে পারতো গর্বের বিষয়- যা হতে পারত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের একটি দীর্ঘ শূন্যস্থান পূরণের ব্যাপার তা পর্যবসিত হলো একটি ব্যর্থতায় যা কোন মতেই না হয়েছে গৌরবজনক প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে, না হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের পক্ষে। এমন হলো কারা এমন একটি সার্থকতাকে ব্যর্থ করে দিল। প্রধানমন্ত্রী কি পর্যালোচনা করবেন কে এই অস্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল এবং কেন করলো? অস্বাভাবিকতা কোথায় ছিল তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্তৃপক্ষ সকলেই জানেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমনের এক সপ্তাহ আগে থেকেই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুরু হয়। ১লা অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা ছিল নজীরবিহীন। সমস্ত ক্যাম্পাসে দখল নেয় বিডিআর, মেয়ে এবং পুরুষ পুলিশ আর আনসার। সাদা পোশাক পরিহিত নিরাপত্তা বাহিনীর লোক যে ছিলই তা না বললেও চলে। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে আনা হলো এক ছাত্রবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় শরৎকালীন বন্ধ হওয়ার কথা ছিল ১লা অক্টোবর থেকে। কয়েকটি পরীক্ষাও ধার্য ছিল ঐ দিন। ১লা অক্টোবর সব ক্লাস ছুটি দিয়ে দেয়া হয় এবং পরীক্ষাও বন্ধ করে দেয়া হয়। একটি পরীক্ষা বন্ধ হলে যে ছাত্র-ছাত্রীদের কি দুর্ভোগ পোয়াতে হয় তা ভুক্তভোগীরাই জানে, তা সত্ত্বেও ঐ দিন পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়া হলো। ঐ পরীক্ষা কবে নেয়া হবে তার কোন তারিখ ধার্য হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বাতিল করার ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে বলে জানা যায়না।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ঐক্য ১০টি দাবী উথাপন করে বলে যে, ছাত্রদের এ দাবী দীর্ঘদিনের এবং এ দাবী মানতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর আগমনে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে আবার তাদের পুরাতন রেষারেষি প্রকাশ পায়। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হলে রতন-সাঈদ গ্রুপের ছাত্ররা তাকে তাড়া করে এবং প্রহার করে। সোহেল ইলিয়াস গ্রুপের সমর্থক। ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। এক পর্যায়ে রতন-সাঈদ গ্রুপের কর্মীরা সারোয়ার হোসেন মিঠুকে তাড়া করে এবং সে পুলিশের আশ্রয় চাইলে রতন গ্রুপের ছাত্ররা তাকে মামুনের হত্যাকারী বলে অভিযোগ করে। পুলিশ তাকে হেফাজতে নিয়েছে। এসব ঘটনা ঘটেছে যখন বিএনপি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনাকর অবস্থা এখনও আছে। এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার এবং এরা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আয়ত্তাধীন বলে মনে হয় না। তা না হলে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে যখন দায়িত্ব ছিল তাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শান্তি রক্ষা করার তখন তারাই শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াল পুরাতন বিরোধের কারণে।

প্রধানমন্ত্রীকে ছাত্রদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য রাস্তার পাশে উপস্থিত ছিল ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের হাত যার মধ্যে জগন্নাথ ও ফজলুল হক হল ছাড়া অন্য সব হলের ব্যানার ছিল। ছাত্রদলের কর্মকান্ড স্থগিত করার কারণে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান হয়নি বলে মনে হয়। তবে ১৪টি হলের মধ্যে ১২টি হলের ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান হয়। ছাত্রলীগের একটি মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। তার ফলে সেখানে গন্ডগোল হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। বেশ কয়েক দফা ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলী ছোঁড়ে। ছাত্ররা দাবী জানায় যে, নিরাপত্তার অজুহাতে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানে ছাত্রদের উপস্থিত থাকতে দেয়া হয়নি।

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একজন প্রধানমন্ত্রী যাঁকে 'দেশনেত্রী' বলা হয় আরও বলা হয় যে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে তিনি ক্ষমতায় গেছেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদক প্রদানের জন্য আগমনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংস্থা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করল তাতে মনে পড়ে যায় সামরিক প্রধান প্রশাসক আইয়ুব খানের ঢাকা আগমনের কথা। একইভাবে টিএসসি বিল্ডিং এর ওপর সংস্কার করা হয়েছে। টিএসসির সংস্কারের প্রয়োজন দীর্ঘদিনের এতোদিন তা করা হয়নি। কোন ময়লা আবর্জনা যেন প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর না হয় সে জন্য টিএসসির বাইরের ছোট ছোট চায়ের স্টলগুলো উচ্ছেদ করা হয়েছিল। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছিল। সেদিন ওখানকার আবহাওয়া স্বাভাবিক ছিল না। একটি অস্বাভাবিক চেহারা দেখানো হলো প্রধানমন্ত্রীকে। এমনিভাবে স্তাবকের দল সরকার প্রধানকে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানতে দেয় না। তারা দেখায় সব কিছুই স্বাভাবিক আছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই কিন্তু যেভাবে তিনটি বেষ্টনী রচনা করে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় তাও কেউই বলবেন না যে একজন জনসমর্থিত ও জনগণের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর একটি অংশে এসেছেন তাঁর কার্য উপলক্ষে। টিএসসিতে আসার সব ক'টি রাস্তাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল বেশ খানিকটা দূর থেকেই। যে বেষ্টনী রচনা করা হয়েছিল তা ভেদ করে ঢুকতে একজন ছাত্রনেতা যিনি একজন সাংসদও তাঁকেও বেগ পেতে হয়েছিল।

পদক প্রদানের সময় ছাত্রলীগ একটি মিছিল বের করে। মিছিলকারীদের হাতে ছিল ব্যানার তাতে লেখা ছিল 'রক্তাক্ত দশ দফা মানতে হবে', 'ছাত্রী মিছিলে হামলাকারীদের বিচার কর', 'অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার কর', 'সন্ত্রাসীদের কোন দল নেই' ইত্যাদি। এই মিছিলের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হচ্ছে মিছিলকারীর অনেকের মুখের ওপর কাপড় বাঁধা ছিল যা দিয়ে তারা বোধ করি বোঝাতে চেয়েছে যে, তাদের বাকস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করাহয়েছে।

আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছিল তা হচ্ছে ১৯৮২ সালে গণিত শাস্ত্রে মাষ্টার্স সম্মানসহ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হন খান মনজুরে খোদা এবং ১৯৮৩ সালে একই বিভাগে একই কৃতিত্বের অধিকারিণী ইলোরা আমীন একই স্বর্ণপদক পান। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা স্বামী-স্ত্রী এবং উভয়ই বর্তমানে কানাডায় অধ্যয়নরত। খান মনজুরে খোদার পরিচয় দেয়ার সময়ে তাঁর পিতার (যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ইলোরা আমীনের পরিচিতির সময় তাঁর পিতার নাম উল্লেখিত হয়নি। নারীর সমঅধিকার সংবিধানে স্বীকৃত এবং এই অধিকার আদায়ের জন্য যখন পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন চলছে বিশেষ করে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি নারী সংগঠন এ ব্যাপারে সোচ্চার তখন একজন কৃতী শিক্ষার্থিনী যিনি নিজস্ব পরিচয়েই ভাস্বর তাঁর পরিচিতির সময় তাঁর পিতার নাম উল্লেখিত হলো না দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে। যাঁরা এদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁরাও উচ্চ শিক্ষিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁদের কাছ থেকে এ ধরনের ভুল সকলকেই আঘাত করবে।

সর্বদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে এই পদক প্রদান অনুষ্ঠান সরকার প্রধানের জন্য এবং সরকারী দলের জন্য গৌরবজনক হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর জন্য যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা একজন স্বৈরাচারী শাসকের উপযুক্ত ব্যবস্থা। এটা কোন মতেই নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। নিরাপত্তা বিভাগের কাছে এক গোপন খবর ছিল যার কারণে প্রধানমন্ত্রীকে এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচার সুলভ ব্যবস্থার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এনে তাঁর ভাবমূর্তির ওপর কালোছায়া পাত করা হলো। এ বিষয়ে দলের পক্ষ থেকেই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। নিরাপত্তা প্রদান দেশের গণতন্ত্রমনা মানুষকে আহত করেছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি সুযোগ হঠকারিতার কারণে নষ্ট হলো।